তারিখ ... 15 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সংবাদ

বন্ধ হোক শিশুশ্রম

শিক্ষার আলোয় ভরে উঠুক শিশুর জীবন

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

গত ১২ জুন নানা আয়োজনে পালিত হলো বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। এ উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত 'শিশুশ্রম নিরসনে আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক কর্মশালায় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শিশুদের জন্য ৩৮টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৪৬টি মামলা করা হয়েছে বলে জানান। ২০১৬ সালের মধ্যে এ সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের সরিয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে তা বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে ২০২১ সালের মধ্যে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিশুশ্রম দিনদিন বেড়ে চলছে এবং বর্তমানে তা এক আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত পরিবারগুলো তাদের ছেলে বা মেয়ে শিশু সন্তানকে যে কোনও ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করছে। ২০১৩ সালের জরিপ অনুসারে বাংলাদেশে মোট শিশু শ্রমিকের মধ্যে ১৭ লাখ শিশু শ্রমের কাজে নিয়োজিত আছে। এর মধ্যে ১২ লাখের বেশি নিয়োজিত রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। দেশের শিল্পকারখানাসহ আবাসিক এলাকায় স্থাপিত ছোটছোট কারখানার নানা ধরনের শ্রমের কাজ করানো হয় ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুদের দিয়ে। এক তথ্যমতে, বাংলাদেশে বর্তমানে শতকরা ৯৪ ভাগ শিশুশ্রমিক কৃষি এবং অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। প্রায় ৪৭ লাখ শিশু শ্রমিকের মধ্যে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুর সংখ্যা বেশি। আর ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সের প্রায় ৭৫ লাখ শ্রমজীবী শিশুর মধ্যে প্রায় ১৩ লাখ শিশু জনপ্রতি সপ্তাহে ৪৩ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে কাজ করে থাকে। দিনে প্রায় ১২-১৪ ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে এরা নামমাত্র বেতন পায়। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে শ্রমিকদের দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি খাটানো অপরাধ এবং ১৮ বছরের কম বয়সের শিশুদের দিয়ে এ ধরনের কাজ করানো সম্পূর্ণ নিষেধ। বিশ্ব শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক সমীক্ষায় জানা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৮ বছরের নিচে মোট শিশু শ্রমজীবীর সংখ্যা ৬৩ লাখ এবং এ সংখ্যা পৃথিবীর মোট শ্রমজীবী শিশুর ৫ শতাংশ। এসব শ্রমজীবী শিশুরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪৮ ঘন্টা কাজ করে এবং এদের প্রায় অর্ধেকই কোন মজুরি পায় না (তথ্য: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। দেশের প্রচলিত আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট শিল্প কারখানা। ধীরেধীরে এর সংখ্যা বেড়েই চলছে। বিশেষ করে পুরনো ঢাকায় এ ধরনের শিল্প কারখানা বেশি। এসব কারখানায় নিয়মিত চলে নানা রকমের পণ্য উৎপাদনের কাজ। আকারে ছোট হলেও ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের শিকার কারখানারসহ এর পার্শ্ববর্তী এলাকা। কারখানা মালিকদের অধিক মুনাফা লাভের আশায় সেখানে চলে অমানবিক শিশুশ্রম। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এ আবাসিক এলাকায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ঝালাই, প্রে-পেইন্টিং, অটো মোবাইল গ্যারেজ, প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরি কারখানা। এসব কারখানার কার্যক্রম চলে রাস্তার বিশাল একটি অংশজুড়ে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নানা ধরনের দ্রব্য তৈরির কাজ চলার ফলে পথচারীদের অবর্ণনীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারখানা থেকে আগত বর্জ্যে এলাকার পানি ও বাতাস প্রতিনিয়ত দূষিত হতে থাকে। কারখানাগুলোর অন্যতম ক্ষতিকর দিক হচ্ছে শব্দ দূষণ। এ ধরনের শব্দ দূষণের মূল শিকার হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। ছোট বড় শিল্পকারখানায় দীর্ঘকাল ধরে শিশুরা ওয়েল্ডিংয়ের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করলে তীব্র আলো ও শব্দের প্রভাবে সহজে দৃষ্টি ও শ্রবণ বৈকল্যের শিকার হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক চিহ্নিত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে ঝালাই কারখানার কাজ অন্যতম।

বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকের মধ্যে একটি বিশাল অংশ হচ্ছে কন্যাশিশু। এরা গৃহস্থালী কাজে মাকে স্বাভাবিকক্রমেই সাহায্য সহযোগিতা করে যা অন্যান্য পুত্র-সন্তানরা করে না। কিন্তু কন্যাশিশুর এ ধরনের শ্রমের কোন হিসাব করা হয় না। এর বাইরে দরিদ্র পরিবারের বেশির ভাগ কন্যাশিশুদের অন্যত্র গৃহভৃত্যের কাজে লাগানো হয়। সেখানে দুবেলা দুমুঠো খাবারের বিনিময়ে দিনরাত খেটে যেতে হয়। কখনও সামান্য খাবারটুকু থেকেও বঞ্চিত হতে হয় ওদের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওদের বাবা-মায়ের সঙ্গেও দেখা করার সুযোগ দেয়া হয় না। এছাড়া নির্যাতন-নিপীড়ন তো রয়েছেই। সামান্য পান থেকে চুন খসলেই সে মাত্রা আরও বেড়ে যায়। চড়, কিল, থাপ্পড় থেকে শুরু করে বেদম প্রহার করেন গৃহকর্ত্রী। গরম খুন্তির সেঁক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হলেও এর কোন চিকিৎসা দেয়া হয় না। কখনও বিনা চিকিৎসায় বাথরুমে আটকে রাখার ঘটনাও মিডিয়ায় অহরহ প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি বাড়ির পুরুষ সদস্যের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয় অনেক শিশুকে। অমানবিক এসব ধরনের অত্যাচার সহ্য করে পালাবার পথ না পেয়ে কন্যা গৃহভৃত্যদের আত্মহত্যা করার ঘটনাও বিরল নয়। এ সব ঘটনার জন্য দায়ী গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নজির কম।

আইএলও-র তথ্যসূত্র মতে,প্রতিদিন প্রতি মিনিটে বিশ্বের কোথাও না কোথাও একজন শিশু শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, অসুস্থতা বা আঘাতের শিকার হচ্ছে। আইএলও-র সূত্রে আরও জানা যায়, বিশ্বে প্রায় সাড়ে ১১ কোটি শিশু শ্রমিকের অর্ধেকেরও বেশি খনির কাজ থেকে শুরু করে নির্মাণ, কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত এবং বিশ্বজুড়ে শিশু শ্রমিক বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি। বিশ্বে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত মোট শিশুর ৫ দশমিক ৬ শতাংশই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল সময়সীমায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কমলেও সে সময়ে ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শ্রমিকের সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কদের তুলনায় শিশু শ্রমিকদের আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া এবং মৃত্যুর হারও বেশি। তাছাড়া শরীর ও মনের বিকাশে কর্মক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় থাকে শিশুরাই।

শিশুশ্রম বন্ধসহ শিশুদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে সারাবিশ্বে প্রতি বছর ১২ জুন পালিত হয় শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০১৬ সালের মধ্যে শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবৃত করেছে। শিশুশ্রম প্রতিরোধে শিশুশ্রমকে শিশুর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল মনে করে শিশুশ্রম প্রতিরোধে গৃহীত কার্যসূচিতে ২০১৬ সালের মধ্যে বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমকে সম্পূর্ণ বন্ধ করার কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাস্তবতার আলোকে শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয় বিষয়সমূহের প্রতিও গুরুত্ব আরোপিত হয়। আইএলওর সর্বশেষ তথ্যমতে বিশ্বে আজ ২১৫ মিলিয়ন শিশু কোনও না কোনও ভাবে শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশু কঠিন শ্রমে লিপ্ত আছে। এসব শিশুর কাজের প্রতিকূল পরিবেশ তাদের শারীরিক, মানসিক বৈকল্য এনে দেয় যা ধীরেধীরে জীবনের শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়। শিশুশ্রম প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে অবিলম্বে শিশুনীতি বাস্তবায়ন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগবন্ধ করা, আইএলও কনভেনশন ১৮২ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও ১৩৮ অনুসমর্থন করাসহ পথশিশু, ছিন্নমূল শিশু ও শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে কাজ দ্রুততম সময়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্যই মূলত শিশুশ্রমের জন্য দায়ী। সম্পদের অপ্রতুলতা ও অসম বন্টন, সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব বাড়িয়ে চলছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা। বেকারত্ব বাসা বাঁধছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সামাজিক সুস্থ বিকাশের ধারা। শিশুশ্রম একদিকে যেমন শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে সৃষ্টি করছে নানা সামাজিক সমস্যার। কন্যাশিশুদের গৃহকর্মী হিসাবে ব্যাপকভাবে নিযুক্তি সৃষ্টি করছে এক ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যার। বাসাবাড়িতে অন্যের কাজ করতে গিয়ে কন্যাশিশুরা নিজেদের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলছে। পিতৃগৃহে অভাব অনটনের মাঝেও পরিবার পরিজনের সান্নিধ্যে সামান্যতম সম্ভাবনায় বেড়ে ওঠার সুযোগ থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। অন্যদিকে পরের গৃহে কাজ করতে গিয়ে নির্যাতিন নিপীড়নে শিকার হওয়া কন্যাশিশুরা মানসিক বৈকল্যের শিকার হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়। আর যৌন নিপীড়িত বা ধর্ষণের শিকার হলে তো কথাই নেই।

বর্তমানে প্রায় চার বছর মেয়াদি প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০ হাজার শিশুকে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং আগামীতে আরও ৫০ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুকে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উদ্যোগটি অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। শিল্প কলকারখানার বিকাশ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের প্রসার ছাড়া দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব নয়। আবার দারিদ্র্য নির্মূল করা ছাড়া শিশুশ্রমও বন্ধ করা যাবে না। কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগদানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। গৃহকর্মে নিয়োগ ও ভাঙ্গারি খাতকেও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। শিক্ষা বঞ্চিত নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন শিশুদের স্বল্প মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের পর তাদের ঝুঁকিমুক্ত কাজের সংস্থানের জন্য সরকার ও বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুশ্রমের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করাও জরুরি। সব অধিকারবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সমাজের বিত্তবানদের ও রাষ্ট্রকে নিতে হবে। শিশুশ্রম বন্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার থাকলে বাস্তবায়নের পথও উন্মুক্ত হবে। শিশুরা যে জাতির সঞ্চালক শক্তি তাকে চেতনায় লালন ও কাজে লাগাতে পারলে শিশুশ্রম বন্ধ করাও সহজ হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় শিশুনীতি-২০১০ ও শিশু আইন-২০১৩ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সের শিশুদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ দান বন্ধ, শিশুশ্রমের কুফল সম্বন্ধে শিশু ও তার অভিভাবকদের সচেতন করে তোলাসহ উৎপাদনশীল কাজ থেকে তাদের আয় রোজগার বাড়ানো, শিশুদের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে সুশিক্ষিত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলাই হতে পারে শিশুশ্রম বন্ধের স্থায়ী সমাধান। শিশুদের লেখাপড়া, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও মেধা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হলে দেশের দারিদ্র্যবিমোচনসহ উন্নয়নের ধারাকে দ্রুত বিকশিত করার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজে লাগানো সম্ভব হতে পারে।

[লেখক : প্রাবন্ধিক, গল্পকার]